https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অনির্বাণদৃষ্টিতে প্রণবতত্ত্বানুশীলন

ড. চন্দন পই[1]

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বাঙালী ঋষি তথা দার্শনিক হলেন শ্রীমৎ অনির্বাণ। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) ময়মনসিংহে তাঁর আবিভাব হয়। তাঁর পূর্ব নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ধর। তাঁর পিতার নাম রাজচন্দ্র ধর এবং মাতা সুশীলাসুন্দরীদেবী। তাঁরা স্বপরিবারে স্বামী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমৎ অনির্বাণ ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের মে-মাসের ৩১ তারিখে তিনি মৃত্যুলোক পরিত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেন। জীবৎকালে বিভিন্ন লেখন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অমর সৃষ্টি হল 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ঋগ্বেদের গায়ত্রী মণ্ডলের ব্যাখ্যা এবং আটটি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। 'প্রবচন', 'পত্রলেখা', 'যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ', 'দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ', 'গীতানুবচন' ইত্যাদি বহু গ্রন্থের রচনা করেন, এছাড়াও যোগদর্শন, বেদান্তদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনের অনেক তত্ত্বের ভাষ্য রচনা করেন। তেমনই একটি তত্ত্ব হল 'প্রণব' তত্ত্ব। এই তত্ত্বের বিষয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বৈদিক, দার্শনিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই শোধপ্রবন্ধে সেই প্রণবতত্ত্বের গভীর আলোচনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা প্রণবতত্ত্বের উপর রচিত অপর ভাষ্যগুলির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব।

সূচক শব্দ

অনির্বাণ, পতঞ্জলি, প্রণবতত্ত্ব, ব্রহ্ম, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, বেদমীমাংসা, প্রবচন।

AIJITR - Volume - 2, Issue - I, Jan-Feb 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতমাতার গর্ভে যখন একের পর এক মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করে চলেছেন এবং নিজেদের মহান কর্মের দ্বারা দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার কার্যে ব্রতী হয়েছেন, ঠিক তখনই মৌন ভাবে এক মহান ঋষির আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন আধুনিক বাঙালী ঋষি তথা দার্শনিক শ্রীমৎ অনির্বাণ। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) ময়মনসিংহে তাঁর আবিভাব হয়। তাঁর পূর্ব নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ধর। তাঁর পিতার নাম রাজচন্দ্র ধর এবং মাতা সুশীলাসুন্দরীদেবী। স্বপরিবারে স্বামী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনির্বাণ ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'আই এ' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা মহাবিদ্যালয়ে কলাবিভাগে ভর্তি হন। সেখানে সংস্কৃত বিষয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[i] সেখানে বেদ বিষয়ে দুই বৎসর পড়াশোনা সমাপ্ত করে মঠের কার্যে মনোনিবেশ করেন। মঠে অবস্থান কালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে হিমালয়ে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে শিলং হয়ে শেষ বয়সে পুনরায় কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের মে-মাসের ৩১ তারিখে তিনি মৃত্যুলোক পরিত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেন। তিনি জীবৎকালে বিভিন্ন লেখন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অমর সৃষ্টি হল *'বেদ-মীমাংসা'* গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য তিনি 'রবীন্দ্রপুরস্কার'-লাভ করেন। তিনি *ঋগ্বেদের* গায়ত্রী মণ্ডলের ব্যাখ্যা এবং আটটি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। *প্রবচন, পত্রলেখা, যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ, দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ, গীতানুবচন, অন্তর্যোগ* ইত্যাদি পঞ্চাশটিরও অধিক গ্রন্থের রচনা করেন, এছাড়াও *যোগদর্শন, বেদান্তদর্শন* এবং *সাংখ্যদর্শন*-এর অনেক ভাষ্য রচনা করেন। নাস্তিক দর্শন গুলির মধ্যে বৌদ্ধদর্শন বিষয়েও বেশ কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম হল

[1] *SACT, সংস্কৃত বিভাগ, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়, অমরকানন, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, Email Id: chandanpaisanskrit@gmail.com*

AIJITR, Volume-2, Issue-I, January-February 2025, PP. 09-12.
Revised and accepted on 28th January 2025

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

যোগদর্শনের *প্রণবতত্ত্ব*। এই তত্ত্বের বিষয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বৈদিক, দার্শনিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বরের বাচক রূপে প্রণবতত্ত্বের কথা বলেছেন।[ii] নারায়ণতীর্থ তাঁর যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা গ্রন্থে বলেছেন যার উচ্চারণের দ্বারা *ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ অথর্ববেদ, ব্রহ্ম* এবং ব্রাহ্মণদের নাম এবং প্রণাম করা হয় তাকেই প্রণব বলে—''যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব ঋগ্যজুসামাঽথর্বাঙ্গিরসঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নাময়তি চ। তস্মাদুচ্যতে প্রণব ইতি।''[iii] শ্রীমৎ অনির্বাণ *দক্ষিণামূর্তি* গ্রন্থে *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-এর অবলম্বনে বলেছেন-প্রণব চতুষ্পাৎ—চারিটি পাদ হল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। ইন্দ্রিয়বোধে জাগ্রৎ, বৌদ্ধিক প্রত্যয়ে স্বপ্ন আর শক্তির অনুভবে সুষুপ্তি। তিনটিকে জড়িয়ে তুরীয় পাদে প্রপঞ্চোপশম শান্ত শিব অদ্বৈত পুরুষ। এই শেষের পাদটির মধ্যেই ওই তিনটিকে স্থাপিত করতে হবে। তিনটি পাদ তুরীয় পাদের বিসৃষ্টি। চারপাদ মিলে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ, প্রণব-ও তাই।

প্রণবের অর্থ বিস্তারিত দেওয়া আছে *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-এ তা আগেই বলেছি। *জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি* আর *তুরীয়*— আত্মচৈতন্যের এই *চতুষ্পাৎ; বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, ব্রহ্ম*—ব্রহ্মের এই চতুষ্পাৎ; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ আর মহাকারণ—জগতের এই চতুষ্পাৎ; বস্তু, ভাব, শক্তি আর চৈতন্য—বোধের এই চতুষ্পাৎ এ সমস্তেরই বাচক হল 'ওম্' কি-না অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু। আমরা যে ওম্ উচ্চারণ করি তা বৈখরী।[iv]

তার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম আরও তিনটি গুহাহিত পাদ আছে— বোধের দিক্ দিয়ে সেগুলিকে বলতে পারি ভাবনা, জ্যোতি আর স্পন্দ। সবার সব মন্ত্রই শেষ পর্যন্ত ওঙ্কারে পর্যবসিত হয়। সেটি শূন্য চিত্তে বা আকাশে একটি স্পন্দ মাত্র। স্পন্দ জ্যোতি হয়, জ্যোতি ভাবনায় ফোটে মনে, বাক্ হয়ে ফোটে বাইরে। যে-কোনও মন্ত্রের বা দেবতার এই পরম তাৎপর্য। দেবতা মন্ত্র গুরু আর তুমি নিজে—এই চারটি ওতপ্রোত। *দক্ষিণামূর্তি*-ই তোমার আত্মচৈতন্য যা স্ফুরিত হচ্ছে ব্রহ্মচৈতন্যে। আত্মচৈতন্য আর ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে মন্ত্রটি ওম্-এর স্পন্দনরূপে সেতু, আর *দক্ষিণামূর্তি* ওই 'ত্রিষু চতুর্থং তৈলবদ আসেচ্যম্'—এক ফোঁটা তেল জলে ফেললে তা যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি তিনি ওই তিনটিতে তুরীয়রূপে ছড়িয়ে পড়ছেন।[v] এইভাবে তিনি প্রণবের অর্থ করেছেন। যা মন্ত্রের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বা বাচ্য রূপে বিবেচিত হয়।

আমাদের সাধারণের চোখে প্রণব একপদী বাক্, কিন্তু তার তো পঞ্চাঙ্গ— 'অউম্'। অথবা প্রণব বহুপদী? প্রণবের স্থূলরেখাগুলিই আমাদের মনে জাগরিত হয় এবং স্থূলদৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু এই রেখাগুলিকে তত্ত্বগর্ভ বা ভাবগর্ভ বলেই তিনি মনে করেছেন— প্রণবের অঙ্গ আর তার রেখায়ণে তফাত আছে। দুটি এক রীতিতে হয়নি। বাইরে দুটিই পঞ্চাঙ্গ, কিন্তু দুয়ের অনুভবের প্রকারভেদ আছে। 'অউম্' –এ গুলি 'স্বর' বা 'সুর', বেদের ভাষায় বাকের একটানা প্রবাহ। বাক্ যখন একপদী, তখনই তা প্রণব। বহুপদী প্রণব বলে কিছু আছে কি-না জানি না। তবে এই একপদী বাক্ই সহস্রাক্ষরা হয়ে আছে পরমব্যোমে—একথা *ঋক্-সংহিতা*-য় আছে।[vi]

'প্রণব' শব্দের দ্বারা তিনি 'ওঙ্কার'কেই বুঝুয়েছেন। 'ও'-কার একটি সন্ধ্যক্ষর, যা কি-না অ এবং উ-এই দুটি স্বরের সন্ধিতে নিষ্পন্ন হয়। এই ওঙ্কারের উচ্চারণ পদ্ধতি খুব সরল এবং সাবলীল ভাষায় বলেছেন- ও-কারকে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। স্বভাবতই 'ও' দীর্ঘস্বর কি না—দুই মাত্রার স্বর। তাকে আরও দীর্ঘ বা প্লুত উচ্চারণ করা যেতে পারে। সাধারণত ওএর উচ্চারণকে তিন মাত্রার বলে ধরা হয়। আবার প্রথম মাত্রার অর্থাৎ অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দীর্ঘ এবং তৃতীয় মাত্রা ম-কারের প্লুত— একযোগে মোটের উপর ছয় মাত্রা। অকার, উকার, মকার আবার যথাক্রমে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বোধক। অবশ্য কোনটাই প্রাকৃত নয়। যোগচেতনার বা অন্তরাবৃত্ত চেতনার জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি- যথাক্রমে উপনিষদের মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষের। সংবিৎ এদের স্বরূপ। উচ্চারণের সময় বায়ুও হৃদয় কণ্ঠ এবং ভ্রূমধ্যের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বস্রোতা হবে। এই তিনটি মাত্রাকে উপনিষদে আবার 'মৃত্যুমতী'ও বলা হয়েছে অর্থাৎ হৃদয় হতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত প্রাণস্রোতের ওঠা-নামা আছে।

অ উ ম্—এর পর নাদ ও বিন্দু। একটি শক্তি, আরেকটি শিব। এ দুটি যুগনদ্ধ এবং নিত্য। তখনকার ভাবনা হয় অনন্তে প্রসার অথবা অণুতে সঙ্কোচ—সংস্কার অনুসারে চেতনা হয় ছড়িয়ে পড়ে নিত্যস্পন্দিত আকাশ হয়ে বা গুটিয়ে আসে ঘনীভূত বিন্দু হয়ে। ওঙ্কারকে স্বররূপে দেখলে —এই হল সাধনার ক্রম।[vii] তিনি মনে করেন ওঙ্কারেই সমস্ত মন্ত্রের পর্যবসান হয়।

তিনি ওঙ্কারের একটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়েছেন তাঁর *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*-এর ব্যাখ্যায়। সেখানে তিনি বলেছেন- ওঙ্কারের একটা ব্যুৎপত্তি হতে পারে—অ+উম্। অ অনাহত অক্ষর, শিব; আর উম্ উমা, শক্তি। সুতরাং শিব-শক্তির সামরস্য। পুং স্ত্রী উভয়লিঙ্গ। তাই নপুংসক-

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

শব্দ 'ওম্'—'ন এব স্ত্রী ন পুমান্ এষ ন চ এব অয়ং নপুংসঃ' (শ্বেতা.উ. ৫/১০)। অবশ্য সেখানে বলা হয়েছে—তিনি নপুংসকও নয়। যেহেতু সৃষ্টিতে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক ব্যক্তিও পাওয়া যায়। সেই অর্থে তিনি সবার মধ্যে এবং সবার উর্দ্ধে।[viii]

নামের বর্ণনার পাশাপাশি তার রূপের বর্ণনাও তিনি করেছেন। বস্তুতঃ 'প্রণব' একটি বর্ণ (ছবি)। বর্ণ বোঝায় রূপকে। রূপের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি রেখায়—যেমন চিত্রকর স্কেচ করেন। রেখার মাধ্যমে প্রণবের তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য ॐ –এই রূপ আকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই রূপেরও তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছেন-তিনটি বক্ররেখা—একটি উপর থেকে নীচে নামছে, আরেকটি নীচ থেকে উপরে উঠছে। দুয়ের সন্ধিস্থান হতে একটি রেখা ঢেউ-এর মত প্রসারিত হচ্ছে। বলতে পার, চিৎ ও জড়ের, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হতে প্রাণের বিচ্ছুরণ। ত্রিরেখার শীর্ষে চন্দ্রবিন্দু। চন্দ্রকলাটি অর্ধচন্দ্র –অর্ধেক ব্যক্ত, অর্ধেক অব্যক্ত। অষ্টমীর চাঁদের মত। এটি শক্তির প্রতীক। তার মধ্যস্থলে বিন্দু (.) শিবরূপী। এখানেও নীচের তিনটি রেখা মৃত্যুমতী, আর উপরের চন্দ্রবিন্দু অমৃত।[ix] —এটাকেই তিনি ওঙ্কার-প্রতিপাদিত রূপের সূক্ষ্মতত্ত্ব বলে পতিপাদন করেছেন।

আকাশের স্পন্দ হল 'ওম্'—'একপদীবাক্। ওঙ্কারটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—নীচে তিনটি বাঁকা রেখার জড়াজড়ি ॐ একটি কেন্দ্রবিন্দু হতেই তিনটি রেখা বেরিয়ে এসেছে। উপরের বাঁকটি সত্ত্বগুণ, কেন্দ্রবিন্দু থেকে উপরে উঠে আবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। নীচের বাঁকটি তমোগুণ —কেন্দ্রবিন্দু থেকে নীচের দিকে নেমে এসে আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। দু'য়ের সন্ধি থেকে রজোগুণের তরঙ্গ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ত্রিগুণের উর্ধ্বে 'ঁ'একটি বৃত্তের আধখানা দেখানো হয়েছে চন্দ্রকলার আকারে। সমস্ত বৃত্তটি শক্তি নীচের অর্ধেক ব্যক্ত, উপরের অর্ধেক অব্যক্ত। অষ্টমীর চাঁদে ফোন দেখা যায়। বৃত্তটির কেন্দ্রে বিন্দুটি হল শিববিন্দু। চেতনা যেখানে সংহত থেকে বৃত্তের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে উপরেও পাচ্ছি শিবশক্তি, নীচেও তা-ই। একটি বিশ্বাত্মক, আরেকটি বিশ্বাতীত। প্রণবের এই রেখাচিত্রকে বলতে পার সমস্ত রূপের কাঠামো। এখন এই কাঠামোতে মাটি চাপিয়ে রং ফলিয়ে তুমি মূর্তি গড়তে পার। রেখাচিত্রটি উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ।[x]

প্রবচন গ্রন্থে পুনরায় 'প্রণব'-এর একটি বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে তিনি স্বামী সত্যানন্দকে জীবনচেতনার সঙ্গে প্রণবরহস্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়েছেন। সেখানে তিনি জীবনচেতনা এবং প্রণবতত্ত্বকে একাকার করেছেন। তিনি মনে করেন প্রণবের আকৃতির তিনটা ভাগ। ঊর্ধ্বে চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রকলা—মনোলয়ের প্রতীক, মন লয় হয় বিন্দুতে। এই এক ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ ওই চন্দ্রের নীচের দিকে অবতরণ, একটা গ্রন্থিসমেত বিন্দুটি নেমে আসছে—দ্যুলোক হতে। মাঝখানে অন্তরিক্ষলোকের গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে একটি ধারা আরও নীচে নেমে উজিয়ে গেছে। এটা হল চেতনার ভাটিয়ে এসে আবার উজিয়ে যাওয়া। এই গ্রন্থি থেকে (এটি আমাদের মধ্যে হৃদয়গ্রন্থি) একটি ধারা আবার সোজা উপর দিকে উঠে গেছে 'ॐ' এইভাবে। ওটি জীবচেতনার অনন্তের দিকে অভিসার। তার পর্যবসান ওই চন্দ্রবিন্দুতে। এইটি প্রণবের তৃতীয় ভাগ।[xi]

পতঞ্জলির যোগদর্শনে যে ঈশ্বরের কথা আছে, সেখানে ঈশ্বরকে গুণাতীতরূপে প্রতিপাদন করা হয়েছে, কিন্তু *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-এ যে ঈশ্বরের কথা আছে, তিনি একাধারে গুণাতীত আবার অপরপ্রান্তে গুণযুক্তও বটে। পতঞ্জলিতে 'প্রণব'-কে যখন ঈশ্বরের বাচক বলা হচ্ছে, তখন তার লক্ষ্য ওই গুণাতীত পুরুষবিশেষ। তাঁকে কি করে 'প্রণব'-এর ভাবনার পাওয়া যায় তার বিস্তৃত সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-এ। সেখানে অ-উ-ম, এই অক্ষরের দ্বারা গুণময় ত্রিপাদের ভাবনা, আর তারও অতীতে অব্যবহার্য চতুর্থ মাত্রার দ্বারা প্রপঞ্চোপশম শিবের বা *নির্গুণ ব্রহ্মের* উপলব্ধি হয়।[xii]

বীজমন্ত্র প্রণবপুটিত করে জপের বিধান আছে। 'প্রণব' হল ব্রহ্মবীজ। সব দেবতা শেষে লীন হয়ে যান ব্রহ্মে। আমাদের ইষ্ট—শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য গণপতি যা-ই হন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রহ্ম কি-না সচ্চিদানন্দ। 'প্রণব' তাঁরই বাচক। প্রণবপুটিত মন্ত্র জপ করতে করতে অবশেষে দেবতার বীজটি ওই প্রণবে লীন হয়ে যায়। তখন অনাহত হয়ে অর্থাৎ বাগ্-যন্ত্রের কোন সহায়তা না নিয়ে প্রণব স্ফুরিত হয়। স্ফুরিত হয় হৃদয় থেকে, মণিপুর থেকে বা মূলাধার হতেও। হৃদয় হতে স্ফুরিত হচ্ছে, এই ভাবনাই আদিতে প্রশস্ত। ভাবের গাঢ়তার সঙ্গে-সঙ্গে বোধ যখন আরও গভীর হয়, তখন অনুভব হয়, মণিপুর বা ব্রহ্মগ্রন্থি হতে বা মূলাধারের অব্যক্ত হতে 'প্রণব' উঠে আসছে। তার গতি হয় প্রাণের গতির মত অর্থাৎ নীচ থেকে উপরের দিকে, প্রশ্বাসবায়ুকে আশ্রয় করে। এইটি 'প্রণব'-এর 'উৎ-চারণ' বলে তিনি মনে করেন।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

উচ্চারণের গতি ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে থাকে। তাই প্রথমে অ-কারে তিন মাত্রা উচ্চারণ, তারপর উ-কারে দুই মাত্রা, ম-কারে একমাত্রা করে উচ্চারণ। ম-কারের পর একটা অনুরণন আছে—যেমন ঘন্টার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার মত। ওই অনুরণনকে তিনি 'নাদ' রূপে উল্লেখ করেছেন। সেই নাদের পরিমাণ অর্ধমাত্রা। চণ্ডীর প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন—চণ্ডীতে বলা হচ্ছে, এই অর্ধমাত্রা 'যা অনুচ্চার্যা বিশেষতঃ' অর্থাৎ বিশেষ করে কিনা লৌকিক প্রযত্ন দ্বারা এর উচ্চারণ সম্ভব নয়। উচ্চারণ আপনা থেকে হয়, মহাবায়ু চেতনাকে যেন মহাশূন্যের দিকে টেনে নেয়। তখন অনুভব যে ক্রমসূক্ষ্ম হতে থাকে, তাকে তন্ত্রে এই রকম গাণিতিক রূপ দেওয়া হয়েছে $\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}+\frac{১}{৩২}+\frac{১}{৬৪}+\frac{১}{১২৮}=$ এক মাত্রা। তাইতে সব মিলিয়ে প্রণবের সাত মাত্রা। শেষ ভগ্নাংশটিতে চেতনা বিন্দুতে লয় হয়ে যায়। তাইতে প্রণবকে বলা হয় 'পঞ্চ-পর্বা'—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু। অ-উ-ম'তে গুণের ক্রিয়া থাকে। 'নাদ' প্রকৃতি বা শক্তি, 'বিন্দু' পুরুষ।[xiii]

পৌরাণিক মতে ওঙ্কারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অ উ ম –কে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বাচক রূপে স্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-কে অনুসরণ করাই ভাল মনে করেছেন। *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*-এ বলা হচ্ছে—অ জাগরিত-স্থান *বৈশ্বানর,* উ স্বপ্ন-স্থান *তৈজস,* ম সুষুপ্ত-স্থান *প্রাজ্ঞ*। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মাত্রার কথাই আছে—একমাত্রা দুইমাত্রা তিনমাত্রা নয়। তিনি মনে করেন— অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি মাত্রা বোঝাচ্ছে—মনশ্চৈতন্য, বিজ্ঞানচৈতন্য এবং আনন্দচৈতন্য। চতুর্থ-মাত্রাটি প্রপঞ্চোপশম শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ওটিকে বিশ্লেষণ করলে 'নাদ-বিন্দু' পাওয়া যায়। চারটি মাত্রাকে আবার বেদান্তীরা বলেন—*বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা* উচ্চারণে চেতনার অভিযান *জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির* ভিতর দিয়ে তুরীয়ে। *স্বপ্ন* আর *সুষুপ্তি* প্রাকৃত নয় কিন্তু —যৌগিক। বাইরের জগৎ লুপ্ত হয় তাতে, কিন্তু অন্তর্জগৎ জেগে ওঠে।[xiv]

সহজ কথায় বিষয়টা হল জাগ্রত অবস্থাকে লয় করতে হবে স্বপ্নে, অর্থাৎ বাহিরকে অন্তরে মিলিয়ে দিতে হবে। সেই স্বপ্নকে মিলিয়ে দিতে হবে *সুষুপ্তি* অবস্থায়। অর্থাৎ অন্তরের যে-ভাব, সেই ভাবকে লীন করতে হবে বিশুদ্ধ শক্তির স্পন্দে। সেই শক্তির চেতনা তিনিই। তিনিই হলেন প্রপঞ্চোপশম শান্ত এবং শিব। অ-উ-ম- এমনি করে ঘন্টাধ্বনির অনুরণনের মত করে চিত্তকে বস্তু থেকে ভাবে, ভাব থেকে শক্তিতে, শক্তি থেকে চৈতন্যে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আনতে হবে। বাক্ আর মনের সম্পর্ক ওতপ্রোত বলে এই ভাবনা সহায় হয় ওঙ্কারের ওই মাত্রাগুলির 'উচ্চারণ' যা কি না ঊর্ধ্বচালনা —মহাশূন্যে সব বিলীন করে দেওয়া হয়, যেমন ঘন্টার ঢং শব্দ যেরূপে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। — এভাবেই তিনি ওঙ্কারকে পর এবং অপর উভয় *ব্রহ্ম*-এর বাচক রূপে বিশ্লেষণ করেছেন।

সূত্র ও টীকানির্দেশ

i. হালদার, গীতা। (১৪২০ বঙ্গাব্দ)। ঋষি অনির্বাণ (২য় সংস্করণ)। দ্বীপান্বিতা। পৃ. ৪০।
ii. ''তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।'' (যোগসূত্র. ১/২৭)
iii. কর্ণাটক, বিমলা। (সম্পা.) (২০০০)। যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (১ম সংস্করণ)। চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস। পৃ. ৪৪।
iv. অনির্বাণ। (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। দক্ষিণামূর্তি (১ম সংস্করণ)। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। পৃ. ৩৮-৩৯।
v. তদেব। পৃ. ৩৯।
vi. তদেব। পৃ. ৪০।
vii. তদেব। পৃ. ৪১।
viii. অনির্বাণ। (২০২০)। উপনিষৎ-প্রসঙ্গ অষ্টম খণ্ড ছান্দোগ্য উপনিষদ (১ম সংস্করণ)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ.১৩৯।
ix. অনির্বাণ। (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। দক্ষিণামূর্তি (১ম সংস্করণ)। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। পৃ. ৪১।
x. তদেব। পৃ. ৪২।
xi. অনির্বাণ। (১৪০৯ বঙ্গাব্দ)। প্রবচন (অখণ্ড সংস্করণ)। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। পৃ. ২৪৩।
xii. তদেব। পৃ. ১৮৬।
xiii. তদেব। পৃ. ১৮৭।
xiv. তদেব। পৃ. ১৮৮।